তৃতীয় অধ্যায়

মতুয়া ধর্মের পূজা-পার্বণ ও পালনীয় রীতি-নীতির বিস্তারিত আলোচনা

হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন মানুষের সমাজকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের দ্বারা আত্মজাগরণ ঘটালেন। মানুষের মধ্যে তিনি যে ধর্মাচরণের নিয়ম প্রচলন করেন সেই ধর্মাচারণকারী মানুষদের মতুয়া নামে আখ্যায়িত করেন তৎকালীন মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত বিশাল, ভক্ত সমাজকে তিনি প্রথমে ধর্মাদর্শের প্রবর্তন করেন 'মত্ত হয়ে হরিনাম গান' করার রীতি। হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞামত ভক্তরা মত্ত হয়ে 'হরিবল' নামে বিভোর হতেন সেই থেকে মানুষেরা 'হরিনাম'কারী ভক্ত মানুষদের হরিবোলা 'মতো' বা 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে থেকে 'উক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণ' অংশে পাই—

'সবে বলে ও বেটারা হরিবোলা 'মতো'
দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া।।''[১]

সকলে 'মতুয়া' বা 'মতো' আখ্যায় ভূষিত করলেও শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করেন। সেই ধর্ম পালনের রীতি প্রচলন করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্ম জগতবাসীকে জানিয়েছিলেন তা তারকচন্দ্র সরকার স্পষ্টভাবে জানালেন—

''জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
জন্ম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।''[২]

এই 'মতুয়া' ধর্ম দর্শন সূক্ষ্ম 'সনাতন ধর্ম দর্শন' একে অপরের পরিপূরক। এই সনাতন ধর্মকে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বলেছেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর প্রবর্তিত ধর্ম দর্শনই ভারতের আদি ধর্মদর্শন। যা সনাতন (পুরানো) ধর্ম-দর্শন নামে খ্যাত। যার আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল ৬৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও পূর্বে। এই সনাতন ধর্মকে আবার

ভূতের ধর্মও বলা হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। এই সনাতন ধর্মদর্শনকে আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুগপোযোগী করে যারা সংস্কার করতেন তাদের বলা হত জ্ঞানী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই সনাতনী ভূতের ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন করেন নবভাবে যা যথার্থভাবেই যুগপোযোগী করে জনসাধারণ্যে প্রচার করেন। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মদান করেন তা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম তৎকালীন সামাজিক। লোকের আখ্যা 'মতুয়া ধর্ম' ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম একই। 'হরিনাম' মত্ত হয়ে করত বলে 'মতুয়া' খ্যাতি মূলত এটি 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম'।

হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্ম সংস্কার করে 'সূক্ষ্ম সনাতন' ধর্ম দর্শন' মানুষের সমাজে জাগরণ করলেন সেই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালনকারী ভক্ত সমাজ বা মতুয়া ধর্ম পালনকারী ভক্ত মানুষেরা কীভাবে পূজা-পার্বণ ও রীতিনীতি পালন করেন তারই বিস্তারিত আলোচনা এই তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

আলোচনার সুবিধার জন্য মতুয়াধর্মের পূজাপার্বণ ও রীতিনীতিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া হল—

পূজার সামগ্রিক আলোচনা।

মতুয়া ভক্তগণের সামাজিক পালনীয় রীতিনীতির সবিস্তার আলোচনা।

পূজার সামগ্রিক আলোচনা:

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' পালনের জন্য প্রথমেই যে কথাটি মনে পড়ে তা হল ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে মূর্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সেই বিশেষ মূর্তির নানাভাবে স্তব স্তুতির দ্বারা ভগবানের নাম গান করে থাকেন। তার কীর্ত্তি কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'সূক্ষ্মসনাতন ধর্ম' পালনের জন্য যে কর্ম করা হয় সেই ধর্ম কর্মের সবিস্তার আলোচনা করছি। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক বহুভক্ত হরিচাঁদ ঠাকুর আত্মসমর্পণ করে তাঁর ভক্ত হন হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর আদর্শিত পথের সন্ধান দেন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যেমন তেমনি ভাবে বিভিন্ন জেলায় জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগ জনিত কারণে বহু মানুষ

অধুনা পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে চলে আসেন। আর তাদের নিত্য আত্মারূপ ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুরকেও ভক্তগণ ও তাঁর ধর্মাদর্শকে তাদের সঙ্গে এদেশে নিয়ে আসেন। আর সেই আত্মসমর্পিত ভক্তরা যে ভাবে নিজেদের হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে সমর্পণ করে মানব জীবন অতিবাহিত করছেন। আবার কোন মানুষ যদি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে চান তাহলে কোন আত্মসমর্পিত ভক্ত মানুষই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে তাকে নিয়ে যান বা তার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন। এইভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেন তারাও আবার কোন মানুষকে তাঁর মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন আবার অনেকেই নিজেরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের সন্ধান করে নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন। এই ভাবে ভক্তি ধারার বিস্তার ঘটে চলে। হরিচাঁদ ঠাকুর বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে যোগ্য উত্তরসূরী পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল কর্মাদর্শকে বাস্তবে পরিণত করেন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মসমর্পিত ভক্ত মানুষেরা ঠাকুরের প্রয়াণের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সকলেই ধর্মাদর্শ যেমন পালন করেছেন তেমনি কর্মাদর্শকেও পালন করেছেন। মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের বিস্তার ঘটেছে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরচাঁদ ঠাকুর ও তৎকালীন ভক্ত মানুষের একযোগে ধর্ম ও কর্মকে সম্মিলন করে কর্মের মাধ্যমে। আজও মতুয়া ভক্তগণ যেমন ধর্ম কর্ম করেন তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর উত্তরসূরীরাও যথাসম্ভব ভক্তদের সঙ্গে একযোগে কর্ম সম্পাদন করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শনাশায় মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস গিয়েছেন। কিন্তু প্রাণের যে চিরায়ত বিশ্বাস ঠাকুরের নাম বা ঠাকুর দর্শন করে জীবন ত্যাগ করলে মৃত্যুর পর ভগবান পাওয়া যায়। মানুষ এই জীবন সংসারে সুখী হতে চায় এটাই চির আকাঙ্খানীয় বিষয়। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের ইচ্ছে—

''মরিলে ঠাকুর দেখে পর কাল পাব।''[৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নিজেই অন্তর্যামী হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিয়েছেন—

''প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।
মরিলিত ভাল করে মর মোর কাছে।''[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ভগবান সন্ধান করে ভক্তগণ যেমন ব্যর্থ হয়নি তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুর

জীবন সম্বন্ধে দুঃখ জর্জর মানুষকে সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ করে তুলে তাদের দিয়েছেন মানুষের মুক্তি কর্মে নিয়োজিত করে। এখানে তারা যেমন জীবনে ধর্ম-কর্মের দ্বারা নিজের জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন তেমনি অন্য মানুষকেও সুখের সন্ধানের পথ নির্দেশ করতে বলতেন হরিচাঁদ ঠাকুর। এভাবেই তিনি মানুষের আপনার জন হয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভক্ত সমাজকে সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে জীবনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেই আদর্শই মতুয়াভক্তদের আদর্শ জীবন যাপনের মূল ধন স্বরূপ।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন তা যথার্থভাবেই বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম কর্মময় জীবন গঠনের পরিপূরক। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই ধর্মাদর্শকেই মতুয়া ভক্তরা পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতে মতুয়াদের গুরু বা ভগবানকে সেকথা ব্যক্ত করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতটি হল—

''অজ্ঞান আঁধার যিনি করিবে উজ্জ্বল।
তিনি গুরু তাঁর কাছে আছে মোক্ষফল।।
.....
.....
মতুয়ার একগুরু ভিন্ন গুরু নাই।
ওড়াকান্দি প্রভু যিনি ক্ষীরোদের সাঁই।।''[৫]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ দান করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করান যিনি তাকে 'ধরা' বলে অবিহিত করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। যিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ পথে মানুষকে ধরে আনেন হরিচাঁদ ঠাকুরের মাহাত্ম জ্ঞাপন করেন, তিনি অর্থাৎ সেই ভক্ত মানুষকে 'ধরা' বলা হয়। যিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তিনি 'মরা' নামে পরিচিত হন। অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তকে বলা হয় 'মরা'। বলা যায় পূর্বের ধর্ম সংস্কার ত্যাগ করে নবভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে নবজীবন লাভ করা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা হল—

''যিনি ধরে আনে দলে তারে 'ধরা' কয়।
ঠাকুরের কাছে গেলে তারে 'মরা' কয়।''[৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ দান করেন এমন একজন 'ধরা' ভক্ত মানুষের পরিচয় গ্রহণ করব।

যিনি হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ মানুষের মাঝে দান করেন তাদেরকে 'ধরা' নামে অভিহিত করেন মতুয়া ভক্তগণ। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে প্রথমে নিজেই আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের অসীম করুণায় ধর্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েছেন। এবং পরে সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ কৃপা করে মানুষের কল্যাণে তিনি শিখিয়ে দেন; আত্মসমর্পণ করে কীভাবে ভক্ত হয়ে মানুষের জীবনকে ধর্ম-কর্ম করে সাফল্য মণ্ডিত করা যায়। এমন একজন মানুষ মনিচাঁদ গোসাঁই তিনি মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে সকলকে জানান।

মনিচাঁদ গোঁসাই 'ধরা' মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করান এভাবে—প্রথমে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে এবং পিতা-মাতাকে পূজার পর হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ধরাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে ধর্মাদর্শ গ্রহণ করার জন্য আসন গ্রহণ করতে হয়। একজন বা সমবেত অনেক মানুষও একসঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে।

হরিচাঁদ ঠাকুর শান্তি দেবীর মঙ্গলঘট স্থাপন করে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে তারপর প্রতিজ্ঞা করান 'সদা সত্য কথা বলিব, সত্যের গান গাহিব' এভাবে তিনবার বলার পর 'হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করান যে 'জানবো তোমায় মানবো তোমায়।' তিনবার। এরপর বন্দনা করান—

''জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরী দাস।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চসহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ করি মোরে কর আত্মসাৎ।''[৭]

নতুন ভক্তকে তার ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ধরা বা মতুয়াচার্য বলেন—শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দি শ্রীশ্রীহরিগুরু ধর্মাদর্শে আদর্শিত। তিনবার। সবশেষে বাহু তুলে 'হরিবল' নাম উচ্চারণ করতে

হয়। আর যে ব্যক্তি এই ধর্মাদর্শ ভক্তগণকে দান করেন তিনি 'নামদেন' বা 'নামনেবে' বলেন। নাম বলতে 'হরিনাম' 'হরিবল' নামকে বোঝায়। অর্থাৎ 'হরিবল' নামদান করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে। যখন প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায় 'হরিবল' মহামন্ত্রই একমাত্র দান করতে বলেন। আর তিনিই চরিত্রকে গঠনের জন্য যে আদর্শ দিয়েছিলেন আজও সেই একই আদর্শ বহন করে চলেন। পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে চরিত্র গঠনের সামগ্রিক দিক আলোচিত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ দিতেন সকল ভক্তকে একত্রকে সকলের উপযোগী করে। যাতে ভক্তদের মধ্যে সর্বভাবে ঐক্য রক্ষিত হয়। আর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একই ঐক্য স্থাপিত হয়ে আছে। মতুয়া ভক্তগণ সকলেই এক আদর্শ বহন করেন তা হল হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম কর্মাদর্শ।

পূজাবিধি ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম সম্পর্কে নির্দেশ দান :

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মতই মতুয়া ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত ধর্মমত ও কর্মগুলিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেন। কেননা নবধর্মমত গঠন হলে তার সার্বিক ক্রিয়া কর্মও থাকা দরকার। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ক্রিয়ার বিধি দিয়েছেন আর কাজে রূপান্তর করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করে ভক্তি করা প্রচলন হলেও গুরুচাঁদ ঠাকুরই সকল মতুয়া ভক্তকে শ্রীহরি মন্দির নির্মাণও নিত্য পূজার প্রচলন করে 'হরিনাম' করার রীতি প্রচলন করেন। আর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র 'শ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে বন্দনা করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সেটিই মূল বন্দনা শান্তি হরি পূজার। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই মহোৎসব পালনের নিয়ম ভক্তকে শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া হরিচাঁদ ঠাকুর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূজার কঠিন নিয়ম না থাকলেও পূজার যে সাধারণ রীতির উল্লেখ করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই আদর্শ ধরে ভক্ত প্রধানরা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজার প্রচলন করেন। ড. নন্দদুলাল মহন্ত তাঁর 'মতুয়া তত্ত্ব দর্শন ও সাধন পদ্ধতি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছা ও আদেশক্রমে মতুয়া ভক্ত সমাজে শ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীহরি পূজার প্রচলন হয়। প্রথম পর্যায়ে পূজা সম্বন্ধে সর্ব সম্মত কোন বিধান বিধি রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। যে দেশে বা যে অঞ্চলে যে ভক্ত প্রধানকে অনুসরণ করিয়া যে ভক্ত সমাজ

চলিত সেই প্রধানের উপদেশ মতেই পূজা বিধি পালিত হত। মতুয়াতত্ত্ব দর্শন ও সাধন পদ্ধতি গুরুচাঁদ ঠাকুরের 'হরিবল' নাম করে নামে ভীর দিতে বলেছেন শ্রীহরিমন্দিরে। আর এই শ্রীহরিমন্দিরে কার পূজা করবেন ভক্তগণ সে সম্বন্ধেও বলেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মতই শ্রীহরিমন্দির, পূজার বিধি, সকলই নির্ধারিত হয়েছে। ধর্ম ও কর্ম যাই করা হোক না কেন মূলত ভক্তি জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহযোগে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর শ্রীহরি মন্দির গঠন ও শ্রীহরিমন্দিরে কার পূজা করবেন ভক্তগণ সেই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন—

.....

''তাই বলি ঘরে ঘরে গড় হে মন্দির।
সকাল সন্ধ্যায় সেথা নামে দাও ভীর।।
শ্রীহরিমন্দিরে পূজা করিবে কাহার?
শুন সবে বলি আমি সেই সমাচার।।
বিশ্ব ভরে এই নীতি দেখি পরম্পর।
যে যারে উদ্ধার করে সে তার ঈশ্বর।।
মম পিতা হরিচাঁদ ক্ষীরোদ ঈশ্বর।
দয়া করে এজগতে হল অবতার।।
দলিত পীড়িত যত পতিত মানব।
তাঁর কৃপাগুণে রক্ষা পাইয়াছে সব।।
তাঁর পূজা কর সবে তাঁর ভক্ত হও।
শ্রীহরি মন্দিরে তাঁর মূরতি সাজাও।''[৮]

তাই শ্রীহরিমন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবী প্রতিকৃতিতেই পূজা করা হয়। কারণ গৃহধর্ম রক্ষা করেছেন পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি জগৎপিতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও জগৎমাতা শান্তিদেবী। মতুয়াধর্মের প্রধান পূজা হল হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা। মতুয়া ভক্তগণ শুদ্ধ ভক্তিতে পূজা করে থাকেন। সেই পূজার নিয়মাবলী হল— হরিচাঁদ ঠাকুরও শান্তি মাতার পূজার নিয়ম সর্ব অবস্থায় সব জায়গায় একই ভাবে পালন করা হয়। একথা বলার অর্থ হল কোন ভক্তালয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা ও সর্বজনীন হরিমন্দিরের পূজা একই নিয়মে হয়।

প্রথমেই পূজার রীতিনীতির আলোচনা। মতুয়া সম্প্রদায়ের যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথম রীতি বা বিধান হলো কবিরসরাজ শ্রীমৎ তারকচন্দ্র সরকার বিরচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের মূল বন্দনা পাঠ।

পূজার উপকরণ সামগ্রী—পাঁচ রকমের ফল ও পাঁচ রকমের মিষ্টি। যথাসম্ভব ফুল সংগ্রহ করতে হবে। সাদা ফুল আবশ্যক। চন্দন, ঘৃত, মধু, কাঁচা দুধ, ডাব, জলপূর্ণ ঘট, সুপারি, আম্রপল্লব। ঠাকুরের জন্য ও মায়ের যথাসম্ভব নববস্ত্র ও প্রসাধন সামগ্রি। বরণ কুলা, প্রদীপ, বরণ সরা, ধান দূর্বা, নতুন সুতা ও মন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মায়ের পূজা হলে অবশ্যই 'নিশান' উত্তলোন করতে হয়। যা তারকের নিশান নামে পরিচিত। 'নিশানকে কাঁচা হলুদ, গিলে, মেথি, নিমপাতা একত্র করে বেটে নিয়ে সরিষার তেল দিয়ে নিশানের গায়ে মাখিয়ে নিকটস্থ পুকুর বা নদী থেকে স্নান করিয়ে আনা হয় হরিধ্বনিও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। এছাড়াও এই একই সময়ে অনেক ভক্ত নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে মন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মায়ের ঘট স্থাপনের জন্য জল বরণ করে আনা হয়। জলবরণ করেন ত্রয়োস্ত্রীগণ যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শে আদর্শিত তারাই। জলপূর্ণ করতে হয় গঙ্গবরণ করে। এই সময় বড় পিতলের কলসিতে জলপূর্ণ করতে হয় সেটিতে আম্রসর দিয়ে ও নববস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে নিয়ে যেতে হয় ও এক ডুব দিয়ে কলসিপূর্ণ করে 'হরিবল' বলে মাথায় করে নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে মন্দির প্রাঙ্গণে। বিশেষত বুধবার এই ঘট স্থাপন করা হয়।

পূজার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় :

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের পূজার জন্য শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী সচ্চরিত্র সত্যবাদী ব্যক্তি পূজারী হন। 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ পূজা বিধি' গ্রন্থে পূজা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

> ''যথাসম্ভব নিজে ফুল তুলিবে, ধূপ-দীপ জ্বালাইবে, চন্দন ঘষিবে,
> ফুল-দূর্বা প্রভৃতিতে চন্দন মাখাইবে এবং নৈবেদ্য সাজাইবে।
> ফুল না পাইলে দূর্বা দিবে। ... ঠাকুরের মাথায়ও পায়ে চন্দন
> এবং মায়ের কপালে সিন্দুর ও গায়ে চন্দন দিবে। (ফুলে চন্দন
> মাখাইয়া তারপর দিবে।) নৈবেদ্যর উপরে ফুল চন্দন দিবে না;

...। চন্দন ঘষিবার সময় গায়ের বল ছাড়িয়া ঘষিবে। কারণ চন্দন জোরে ঘষিলে কাঠের কুঁচি কাটে, তাহা ঠাকুরের গায়ে ফোটে। সেই জন্য গায়ের বল ছাড়িয়া ঘষিলে গুঁড়া থাকিবে না। ইহা-ই অ-গুরু চন্দন। ফুলের বোঁটা বা পাঁপড়িতে আল বা কাঁটা যুক্ত থাকে, সেই জন্য ইহাও ফেলিয়া দিবে। পূজার সময় ও শেষে হুলুধ্বনি হরিধ্বনি সহকারে কাঁশ ডঙ্কা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিবে।''[৯]

ঘট স্থাপন প্রসঙ্গে যে নিয়ম পালন করা হয় তা হল—ঘট স্থাপন মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের পূজার প্রধান বিষয়। পূর্ণ ব্রহ্ম হরিচাঁদ ঠাকুর জগন্মাতা শ্রীশ্রীশান্তিদেবীর উদ্দেশ্যে সকল মতুয়া গৃহেই এই ঘট স্থাপন করা হয়। ভক্তের সাধ্যমত মন্দিরে বা গৃহ মধ্য এই ঘট স্থাপন করা হয়। বৎসরের যে কোন মাসের 'বুধবার' ঘট স্থাপন করা যায়। পূর্ব দিন সন্ধ্যায় 'অধিবাস' করে সারারাত 'হরিবল' এই মহাকীর্ত্তন করা হয়। ঘট স্থাপনের এক বৎসর পর পুনরায় ঐদিনে ঐ তারিখেই ঘট পরিবর্তন করে নবভাবে সমবেত হরিধ্বনি সহযোগে ঘট বসানো হয়। ঘট বসানোর পর বন্দনা পাঠ করা হয়। ঘট বসানোর পর ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। শুদ্ধ পবিত্র পাত্রে ভাত নিরামিশ ও নানারকম মিষ্টান্ন সহযোগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। এবং শেষে কীর্ত্তন করে হরিধ্বনি করে সকল ভক্ত সমেত সেই ভোগ প্রসাদ সকলে মিলে এক সাথে পংক্তি ভোজের দ্বারা মহোৎসব শেষ হয়। মহোৎসবে সকল ভক্তগণ একে অপরকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম করেন। মতুয়াগণ প্রার্থনা করেন সমবেতভাবে এই বন্দনাটি—

''জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস।
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।

জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।

নিজ করি মোরে কর আত্মসাৎ।।''[১০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মহোৎসবে বা মহাবারুণীর পূণ্য প্রভাতে প্রভাত সংগীতটি গাওয়া হয়। প্রভাতী গীতি হিসাবে। অশ্বিনী কুমার সরকার হল 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত' রচয়িতা এক কবি ও মহাসাধক। তিনি মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই নামে পরিচিত। অশ্বিনী গোঁসাই ছিলেন প্রেমিক শিরোমণি। অশ্বিনী কুমারের 'শ্রীশ্রীহরিসংগীত' ও কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন' গানের বিখ্যাত বই। এই গ্রন্থ থেকে ভক্তগণ গান করেন মতুয়া ধর্মের হরিসভা ও মহোৎসবগুলিতে ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন। এগুলি ভক্তিগীতি নামে পরিচিত।

অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটির বিষয়বস্তু সত্যিই মন প্রাণ হরণকারী। প্রভাত বেলায় কীর্ত্তনের সুন্দর মনোরম পরিবেশে এই হৃদয় হরণকারী গানটি গেয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীকে জাগান হয়—শ্রীহরি সঙ্গীতটি হল—

''প্রাণমতি শুকশারী, পোহাল শর্ব্বরী, শ্রীহরি মঙ্গল গাও হে।

শ্রীহরি মঙ্গল গাওহে, প্রেমানন্দে মাতিয়া রও হে।।

১. হৃদি নিধুবনে, শান্তি মায়ের সনে শ্রীহরিচাঁদকে জাগাও হে।

যুগল মিলন করি, যুগল নয়ন ভরি, হরিরূপ বসে ডুবে রও হে।।

২. নিশি হল ভোর, রসনা ভ্রমর, গুণগুণ স্বরে গুণ গাও হে।

হরিপদ পঙ্কজে, সতত থাক মজে, হরিপদ রজে গড়ি দাও হে।।

৩. হরিরূপ আলোকে, মনের পুলকে, নিরানন্দ উলুকে তাড়াও হে।

হইয়া চৈতন্য, এ দেহ কর ধন্য, সাধু সঙ্গ বাতাস লাগাও হে।।

৪. নিশি প্রভাত সময়ে, প্রেমানন্দ হৃদয়, পুলকে পুর্ণিত হও হে।

আলস্য ত্যাজিয়া, হরিপদে মজিয়া, হরিচাঁদ প্রভাতী গাও হে।।

৫. হরিপদ পল্লব, দেবেরও দুর্লভ কায়মনে স্মরণ ও লও হে।

শয়নে স্বপনে, জাগরণে বদনে, নাম মধু পানে মত্ত হও হে।।

৬. তারক মহানন্দ, গোঁসাই গোলকচন্দ্র, প্রেমধন যাচে জীবে লওহে।

হেন দয়াল ভবে আর কি খুঁজিয়া পাবে, চরণে স্মরণ লওহে।।

৭. শ্রীগুরু চাঁদ বলে, নিশি প্রভাত কালে, আলস্যে অবশ্য কেন হও হে।

(অলস) অশ্বিনী অধম, ত্যাজিয়া মায়াঘুম বসিয়া হরিগুণ গাও হে।''[১১]

নিত্য শুদ্ধাচারে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা করা হয়। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন—

''স্নান শুচি হয়ে ঠাকুর পূজা করিবে।
ত্রিতাপ পাপ হইতে রেহাই পাইবে।।
পূজায় অর্ঘ্য দিবে ভক্তি শ্রদ্ধা অঞ্জলী।
কামনা বাসনা যেন দূরে রাখ ঠেলী।।''[১২]

হরিভক্ত অশ্বিনী গোঁসাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্ত প্রেমিক কবি। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়াধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের নিয়ম রীতিকে তিনি দেখেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তির আদর্শকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদা রক্ষা করেছেন এবং তার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ঘরে ঘরে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে জানুক বুঝুক ও গ্রহণ করুক। তবেই তার মানুষের জন্য এত গভীর জীবন দর্শন স্বার্থক হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের উদ্দেশ্যে তাই সরবে ঘোষণা করেন—

''পবিত্রতা, সত্য বাক্য মানুষে বিশ্বাস।
তিন রত্ন যার আছে হরি তার বশ।।''[১৩]

এই চরিত্র গঠনের দ্বারা যদি মানুষের মানস গঠন হয় তাহলে মানুষের জীবনের পূর্ণ শান্তি লাভ হবে। আর ধর্মাচরণ ধর্ম জীবন যাপন প্রসঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে অভিমত পোষণ করেন তা হল—

''দীক্ষা তো স্বীকৃতি মাত্র হব আমি ভাল।
হব ভালো রব ভালো কব আমি ভাল।।
.....
ভালো হলে ভালো হবে মোর পিতা কয়।।
.....
শ্রীহরি মন্দিরে নিত্য পূজা করা চাই।।''[১৪]

আসলে একটি শিক্ষা জগতের জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্খায় সেই ধর্মমত গ্রহণ করা। এটি আত্ম জ্ঞান লাভের জায়গা। আর এখানে আত্মদর্শি মানুষেরাই শিক্ষা দেন। এই যে পূজা করা সেটিও প্রতিনিয়ত করতে করতে কর্মের অভিজ্ঞতা হয়। তেমনি 'হরিবল' নাম নিত্য করতে

থাকলে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের করুণা লাভে আত্মদর্শন করে মানুষের জীবন সার্থক করা যায়।

আজকের তথা বাস্তব জগতের এই জ্ঞান লাভ করতে হলে কোন একটি ভাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে সেই স্কুলের পাঠ্য বই ও শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা নিতে থাকলে এক সময় স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পর আরো উচ্চ শিক্ষা ও আরো উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তেমনি ভাবে ধর্মাচারণ করতে করতে ধর্ম জ্ঞান লাভ করা যায়।

আর যে মহাসত্য সর্ব সময় সর্বকালে জয় লাভ করে তা হল ধর্ম জীবন সৎ ভাবে পালন করে জীবন যাপন করলে জয় অনিবার্য। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জয় হবেই এবং এই ধর্ম ও কর্মী হলে জীবনে শান্তি আসবেই এই সত্যকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর বজ্র কণ্ঠে বলেন—

''শ্রীহরি এনেছে ইহা বিশ্বের দুয়ারে।
বিশ্বভরে এই ভাব হোক ঘরে ঘরে।।
সে ধর্ম যাজন যেবা করে মনে প্রাণে।
দেবে দুর্লভ শান্তি লভে একদিনে।।
সর্ব্বতত্ত্ব মূলে এক তত্ত্ব জান সার।
'যথাধর্ম্ম তথা জয়' কথা নাহি আর।''[১৫]

ভক্ত গৃহে মতুয়াদের মধ্যে যে বড় উৎসব পালিত হয় তা হল মহোৎসব। এই মহোৎসব ভক্ত গৃহে হয়। আবার সর্বজনীন হরিমন্দিরেও হয়। মহোৎসব উৎসবের প্রথম উৎস হিসাবে পাই কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। 'ভক্তা নায়েরীর মহোৎসব' আখ্যানের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্য বিধবা নায়েরী হরিভক্ত হয়। ভক্তা নায়েবীর, ইচ্ছে তাঁর সম্পত্তির ভক্তির কাজে যথাযোগ্য ব্যবহারের। ভক্তের অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে আজ্ঞা দেন মহোৎসব করার। স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী ভক্তানায়েরীর নিমন্ত্রণ দেন গোলক পাগল। আর এই নায়েরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক অনেক ভক্তগণ। নায়েরীর মনোসাধ ঠাকুরকে জানায় এভাবে—

''ওহে মহাপ্রভু মম আছে কিছু ধন।
আজ্ঞা হলে তব নামে করি বিতরণ।।''[১৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর নায়েরীকে এভাবে নির্দেশ দেন ও মহৎসবের দিন ধার্য্য করে দেন এবং মহোৎসবের নিয়মাবলীও তিনি নিধারণ করে দেন। যা আজও হরি ভক্তদের ও মন্দিরগুলিতে

একই ভাবে পালিত হয়ে চলছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের সেই নির্দেশাবলীকে তারকচন্দ্র কাব্য ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''প্রভু বলে নায়েরী মতুয়া সব ডাক।
জনমের মত এক কীর্ত্তি করি রাখ।।
চাউল লাগিবে তোর বিশকুড়ি মন।
এর উপযুক্ত দ্রব্য কর আয়োজন।।
.....
নিজে প্রভু দিল তার দিন অবধারী।।
প্রভু বলে তোর কিছু করিতে হবে না।
কর গিয়া আয়োজন যে তোর বাসনা।।''[১৭]

ভক্তকে সাহায্য হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং করতে শিখিয়েছেন সকল ভক্তগণকে। একে অপরকে কার্য্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা সৌভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক। সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃঢ় সূত্রপাত করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি মানুষে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে বজায় রেখে চলার নির্দেশ দেন। মতুয়া ভক্তরা এখনও মানুষ সম্পর্কে ভ্রাতৃভাব পোষণ করে থাকেন। মানুষে মানুষের সম্পর্ক হল 'মানুষ মানুষ, ভাই ভাই।' এই পরিচয় পাই হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ দানের মধ্যেই।

হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক পাগলকে ডেকে বলেন—

''নায়েরী করিল সাধু সেবা আয়োজন।
এদিকে ঠাকুর দিতেছেন নিমন্ত্রণ।।
গোলক পাগলে ডেকে বলে হরিচাঁদ।
মহোৎসব করিবারে নায়েরীর সাধ।।
যাহ বাছা নিমন্ত্রণ করহ সবারে।
পরস্পর বলাবলি যে দেখ যাহারে।।
বৈশাখের সাতাশে আটাশে ঊনত্রিশে।
তিনদিন মহোৎসব করিবা হরিষে।।
পূর্ব্বদিন অধিবাস ভোজ মধ্য দিনে।

শেষদিন প্রহরেক নাম সংকীর্ত্তনে।।

মহোৎসবে বাজে কথা কহিতে দিবে না।

খাবে আর হরিনাম গাবে সর্ব্বজনা।।

হরি ভিন্ন আর নাহি কর গণ্ডগোল।

শুধু মাত্র বলাইবা সুধা হরি বোল।।''[১৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে গোলক পাগল নিমন্ত্রণ শুরু করেন।

''সেই দিন হতে স্বামী গোলক পুলকে।

মহোৎসব নিমন্ত্রণ আরম্ভিল লোকে।''[১৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং মহোৎসবে গিয়ে মহোৎসবের নিমন্ত্রণ দেন সকল ভক্তকে। হরিচাঁদ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ বার্তা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন—

''ওড়াকাঁদি মহোৎসব চৌধুরী বাটীতে।।

স্বয়ং মহাপ্রভু যান চৌধুরী আলয়।

নায়েরীর নিমন্ত্রণ পাগল জানায়।।

ঠাকুর বলেন সবে যাও কলাতলা।

মহোৎসব করিবেক একটী অবলা।।

আমি করিয়াছি আজ্ঞা কেহনা থাকিও।

নায়েরীর মহোৎসবে সকলে যাইও।।

অধিবাস দিন তথা গেলেন পাগল।

ক্রমে হরি বলা চলে বলে হরি বোল।।''[২০]

নায়েরীর মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহোৎসবের সেই বর্ণনার মধ্যে পাই নামকীর্ত্তনের ধরণ ও মহোৎসবের প্রসাদ বিবরণ। আর লোক পরিমাণ সংখ্যাও পাওয়া যায় তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে।

''দিবা নিশী ক্ষান্ত নাই শুধু হরিধ্বনি।।

বাড়ির উপরে করিয়াছে এক স্থান।

সেখানে সকলে করে হরিনাম গান।।

কেহ বসে কেহ উঠে নাচিয়ে নাচিয়ে।

কেহ কেহ ভূমে পড়ে অচৈতন্য হয়ে।।

কেহ প্রেমে ধরা ধরি করে পড়া পড়ি।

কেহ কেহ কেঁদে কেঁদে যায় গড়া গড়ি।।''[২১]

এভাবে 'হরিবল' নাম করেন ভক্তগণ। একে 'নামকীর্ত্তন' বলা হয়। আর মহোৎসবে নায়েরী ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য তালিকা পাওয়া যায়। ও মহোৎসব উৎসবে 'ভীর' দেয় কেউ কেউ। কেউ হরিচাঁদ ঠাকুর বলে ডাকেন। কবি রসরাজের বর্ণনাটি হল—

''তাহার উত্তর পার্শ্বে ভোজনের ঠাই।

যখন যার যা ইচ্ছা খেতেছে সবাই।।

লাবড়া, অম্বল, ডাল ভাজা দধি চিনি।

খেয়ে খেয়ে সকলে দিতেছে হরিধ্বনি।।

কেহ ভীর দেয় বলে সাধু সাবধান।

ক্ষণে পিছাইয়া ক্ষণে হয় আগুয়ান।।

পাতা রাখি ভুমে কেহ এটে হাতে মুখে।

দাঁড়াইয়া বাবা হরিচাঁদ বলে ডাকে।।''[২২]

নায়েরীর মহোৎসবে লোক অনুমান করেছেন এভাবে—

''এই মত তিন দিন মহোৎসব হল।

.....

লোক পরিমাণ অনুমান করি সবে।

দু'হাজার লোক সে মধ্যের দিন হবে।।

শেষ দিন লোক হবে চারি পাঁচ শত।

ভোজন করিল হরিভক্তগণ যত।।

নায়েরীর পূর্ণ হল মনের বাসনা।

প্রেমে পুলকিত দেবী কাঁদিয়া বাঁচে না।''[২৩]

এভাবে ভক্তানায়েরীর বাড়ির মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই থেকে আজকের মহোৎসবের নিয়ম একভাবেই পালিত হয়ে আসছে।

হরিসভা মতুয়া ভক্তদের বাড়িতে পালিত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম গানের মাধ্যমে

হরিসভা পালন করে থাকেন মতুয়া ভক্তগণ। হরিচাঁদ ঠাকুরের বন্দনা পাঠ ও 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত', কীর্ত্তন করা হয়ও 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' পাঠের মধ্য দিয়ে হরিসভা পালন করেন। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ নিয়েই আলোচনা নাম গান করে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করে থাকেন ভক্তগণ। প্রসাদ দেন ভক্তদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

শান্তিসভা : মতুয়া ভক্তা নারীরা শান্তিদেবীর স্মরণে শান্তি সভা পালন করে থাকেন। শান্তি মায়ের স্তবস্তুতি বন্দনার সাহায্যে ভক্তি নিবেদন করে নারীরা শান্তি সভা পালন করে থাকেন। কীর্ত্তন হয়। প্রসাদ সামর্থ অনুযায়ী ফল মিষ্টি পায়সান্ন ও ভাত, ডাল, তরকারী প্রসাদ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। পূজার ফুল দীপ চন্দন বাদ্যযন্ত্র কাসর, ঘন্টা, জয়ডঙ্কা, হারমনিয়াম, জুড়ি, খোল, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

'বুধবার পালন' মতুয়া ভক্তগণ বুধবারকে পালন করেন। এইদিন ঘর দ্বার পরিস্কার করে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রতি ঘরে ঘরে পূজা করা হয়। আর হরিসভা পালন করা হয় বুধবারে। বুধবার সন্ধ্যায় হরিসভার হরিবাসর বসেও ১০-১২ টার মধ্যে রাত হরিবাসর সম্পূর্ণ করেন।

এছাড়াও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন 'দোলযাত্রা'র দিন ভক্তরা পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয় হরিমন্দিরগুলিতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম তিথি হল—

''ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি দোল যাত্রা দিনে।
জন্মিল শ্রীগুরুচাঁদ অতি শুভক্ষণে।।
.....
বারশ চুয়ান্ন সালে শুক্রবার দিনে।
পূর্ব্বাকাশে দীনমণি প্রকাশের কালে।
সেই কালে গুরুচাঁদ জনম লভিলে।।''[২৪]

এই সুযোগ্য পুত্রই মতুয়া ধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিব্যাপ্ত করেন।

মহাবারুণী পালন :

মতুয়া ভক্তগণ 'মহাবারুণী' পালন করেন। মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের সবচয়ে বড় উৎসব

'মহাবারুণীর স্নান' উৎসব। 'মহাবারুণী' পালন করার ইচ্ছায় হরিচাঁদ ঠাকুর একদিন শ্রীধামে ভাবিকালের বারুণীর গুপ্ত অভিসার করেন। এয়োদশী বারুণী তিথিতে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয়। জন্মতিথি অনুযায়ীই মহাবারুণীর স্নান 'হরিবল' নাম কীর্ত্তন করে সম্পন্ন করেন মতুয়া ভক্তগন।

মহাবারুণীর দিন নির্ধারণ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দ্বারা মহাবারুণী পালন শুরু হয়। বারুণীর গুপ্ত অভিসার করেছিলেন একদিন হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মক্ষণ এক মহা শুভলগ্ন। সেই শুভ কালের শুভ কর্ম দ্বারা সেই জন্ম সময়টিকে চির অমর হয়ে থাকবে মতুয়া ভক্তগণের কাছে। তথা মানব সমাজের কাছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসব হল মহাবারুণী। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় থেকে মানুষের জীবন ভাগ্যাকাশ ও নির্মল পবিত্র হয়। ভক্তগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বৎসরের এই দিনগুলির জন্য। বারুণী মানে একটি দিন নয় অনেক দিন আগে থেকেই ভক্তগৃহে বারুণীর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। বারুণীতে যোগদান করার জন্য সমবেত আয়োজন হয়। আবার কোন কোন ভক্ত গৃহে বারুণীর আগের দিন সকল ভক্তকে মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে ভোজন করান। আবার কোন কোন ভক্ত বাড়িতে বারুণীর পরদিন মহোৎসব করেন ভক্তগণকে নিয়ে গিয়ে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িতে মতুয়া ভক্ত দলকে নিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'শ্রীধামে ভাবি বারুণীর গুপ্ত অভিসার' থেকে জানা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের বারুণী পালনের রীতি-নীতি। হরিচাঁদ ঠাকুরের যে মহাবারুণীর মেলা মিলিয়ে ছিলেন গুপ্তভাবে সেই মহাবারুণী ও মহামেলাই গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী সময় করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্মে' বিচরণ পাগল হরিচাঁদ ঠাকুরের মহাবারুণীর পুণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। বিচরণ পাগলের মহাবারুণী সম্পর্কে তথ্যগুলিকে সবিস্তারে তুলে ধরছি আলোচনার সুবিধার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্নেহধন্য ভক্ত হলেন বিচরণ পাগল। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের মানবলীলা সম্বরণের আগে তাঁর এই অভিপ্রায় ছিল মনে। তারই প্রকাশ ঘটান গোপনে। তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে—

''একদা শ্রীহরিচাঁদ বসিয়া নিজ্জনে।
কে যেন কি ভাবিলেন আপনার মনে।।
আর কত কাল আমি থাকিব ধরায়।

হল বুঝি মম লীলা সাঙ্গের সময়।।

অতএব এক কর্ম করিবারে হয়।

ভাবিকালে সেই মেলা দেখিবে সবায়।।

.....

.....

মধুকৃষ্ণ এয়োদশী বার বুধবার।

সেই বুধবারে হল জন্ম আমার।।

.....

বারুণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে।

মহাবারুণীর স্নান জগতে ঘুষিবে।।

গুপ্তভাবে করিব বারুণীর অভিসার।

গুরুচাঁদ হতে পরে হইবে প্রচার।।''[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মহামেলার কীর্ত্তনের রীতিটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন বিচরণ পাগল—

''যেন কত অগণিত মতুয়ার দল।

দলে দলে আসিতেছে বলে হরিবল।।

জয় ডঙ্কা ঝাঁজ কাঁস খোল করতাল।

বাজাইয়া মতোগণে বলে হরিবল।।

বাদ্যোদ্দমে প্রকম্পিত যেন ভূমিতল।

মেঘের মণ্ডলে যেন দেবের বাদল।।

হরিবল রব বিনে অন্য বোল নাই।

কেহ কেহ দেয় হরিচাঁদের দোহাই।।

কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ গড়ি দেয়।

ভূমেতে পড়িয়ে কেহ করে হায় হায়।।

মিলেছে চাঁদের মেলা না হয় তুলনা।

হুলু ধ্বনি দেয় যেন বহুত ললনা।।

.....

.....

বসিয়ে করেছে তারা কীর্ত্তন শ্রবণ।

কাহারো বা বারি ধারা হতেছে পতন।।

বাল বৃদ্ধ পৌঢ় যুবা পুরুষ রমণী।

এক সনে করে যেন হরিনাম ধ্বনি।।

অগণিত লোক এল যেন সংখ্যা নাই।

ভূমি তলে পড়ি কেহ ছাড়িতেছে হাই।।

কেহ বা কীর্ত্তন মাঝে দিতেছে হুঙ্কার।

তা শুনিয়ে দূরে যায় চিত্ত অন্ধকার।।

হতেছে মধুর লীলা অপার অপার।

প্রেমের পাথারে সবে দিতেছে সাতার।।''[২৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর মহাবারুণীর মেলার সূচনা ঘটান এবং পরে পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর তা বাস্তবে ভক্তগণের সঙ্গে কাজে পরিণত করেন। পিতার অন্তরের অভিপ্রায় তথা গুপ্ত কাজ গুরুচাঁদ ঠাকুর বুঝতে পারেন। আর বারুণীর গুপ্ত কাজ গুরুচাঁদ ঠাকুর বুঝতে পারেন। বারুণীর গুপ্ত অভিসার গুরুচাঁদ ঠাকুরও দেখেছিলেন শোভনার সঙ্গে এবং ভাই উমাচরণও ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল কাজকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর পালন করেন মনে প্রাণে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের 'মহাবারুণী' পালনের নিয়মকে আমরা পাই যা বারণীতে পালন করা হয়। যেমন মহাবারুণীর আগের দিন সকল ভক্তগণ দল সাজান করে অর্থাৎ নিশান ডঙ্কা, ঝাঁজ, কাঁস, খোল সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে শ্রীধামে অথবা শ্রীহরিমন্দিরে যেখানে মহাবারুণী পালন হয় সেখানে চলেন 'হরিনাম' করতে করতে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা যে পিতার অভিপ্রায়কে কবে বাস্তবায়িত করতে পারবেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রীধামে মহাবারুণী মহালীলার গুপ্ত অভিসার' নামক অধ্যায়ে। কবির বর্ণনায় ধরা পড়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মনের অভিপ্রায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছার প্রকাশ এখানে উল্লেখ করা হল—

''এই মেলা সুপ্রকাশ হবে কতদিনে।।

দেব নরে একাসনে করিবে কীর্ত্তন।

প্রেমাবেশে মত্ত হবে যত ভক্তগণ।।

কবে বা উড়িবে হরিনামের নিশান।

নেহারিয়ে সেই মেলা জুড়াইব প্রাণ।।

ঘাটে মাঠে কবে হবে নামসংকীর্ত্তন।

কবে আমি হেন ভাব করিব দর্শন।।

প্রবাহিত হবে কবে প্রেমের পরিধি।

প্রেম হিল্লোলে ধুয়ে যাবে বেদ বিধি।।

দলে দলে মতুয়ারা করিবে কীর্ত্তন।

প্রেম ভরে উলু দিবে যত রামাগণ।।

বহিবে প্রেমের বন্যা সম্মুখে আমার।

ভক্ত সঙ্গে মন রঙ্গে খেলিব সাঁতার।''[২৭]

পরদিন সকালে অর্থাৎ সারারাত 'হরিবল' নাম কীর্ত্তনের পর মহাবারুণীর দিন সকালে সকলে মহাবারুণীর স্নান করে শ্রীহরিমন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুরের ও শান্তিদেবীর পূজা করে সকল ভক্তগণ। এভাবে শ্রীধামে ও হরিমন্দিরগুলিতে মহাবারুণীর পালন হয়। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিপ্রায় হল—

''শুনিয়ে আনন্দ রোল জুড়াবে পরাণ।

পরেতে করিবে মহাবারুণীর স্নান।''[২৮]

'মহাবারুণীর পূর্বদিনে অভিসার' পর্বে বারুণীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ভক্তগণের কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। হরিভক্ত মতুয়া ভক্তগণের পরিচয় নেব—

''বারুণীর পূর্বদিনে, কোন মতুয়ার প্রাণে,

দিতে চাহে মতুয়া ভোজন।

হয়ে পুলকিত কায়, যার যাহা সাধ্য হয়,

সেই ভাবে করে আয়োজন।।

দূর দেশ হয়ে যত, আসে হয়ে দলগত,

সবে করে নাম সংকীর্ত্তন।

অগণিত ভাবে সবে, আইসে পরমোৎসবে,

কেহ কেহ করয়ে নর্ত্তন।।

....

.....

বৎসরান্তে একদিনে, দূর হতে মতোগণে,

ধেয়ে আসে নিশান হস্তেতে।

উচ্চরবে হরিনাম, সবে করে অবিরাম

জয়ডঙ্কা শিক্ষা ধ্বনি তাতে।''[২৯]

মতুয়া ভক্তকে সকলে সেবাযত্ন করতে চায় ভক্তি করে। তার পরিচয় পাই এই কয় ছত্রে—

''তোমাদের কৃপাগুণে, আনন্দ পাইব প্রাণে,

অন্তরেতে হবে প্রেমসুখ।

পাইয়ে চরণ ধূলি, আমাদের বংশাবলী,

সবাকার ঘুচে যাবে দুঃখ।।

পথে ঘাটে যে যেখানে, পাইবে মতুয়াগণে,

যত্ন করি নিজ গৃহে নিয়ে।

মুড়ি চিড়া চিনি দধি, তাহার নাহিকো বধি,

সেবা হৃষ্ট চিত্ত হয়ে।।

....

.....

কোথা করে জল ছত্র, মিলিয়ে যতেক ছাত্র,

জ্ঞানীজন থাকে তার পিছে।

আশাপথ পানে চেয়ে, থাকে সবে হৃষ্ট হয়ে।

ঘবে মতো গণ আসে কাছে।।

হয়ে অতি প্রফুল্লিত, মতুয়ার পদধৌত,

করে অতি সযতন করি।

অতি আনন্দিত হয়ে, হস্তেতে বাতাসা দিয়ে,

এনে দেয় সুবাসিত বারি।।

....

.....

আসিতে যাইতে পথে, সেবা করে হেন মতে,

সে ভাবের নাহিক তুলনা।।''[৩০]

রামচাঁদ চৌধুরীর অন্তরের অভিপ্রায় ঠাকুরের জন্মতিথি ধরে 'হরিনাম' গানে সকল ভক্ত মিলে হরিচাঁদ ঠাকুরের স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চান। এই অভিপ্রায় অনেক ভক্তগণ মিলিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে জানান হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি পালনের জন্য। ভক্তগণের অভিপ্রায় এক যোগে পালন করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সকল ভক্তগণ সম্মিলিত হয়ে একথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র জানার পর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বারুণী যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য বাদ্যযন্ত্র নামের নিশান ও বড় বড় তালপাতার পাখা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার গঠন করে ও হরিভক্তগণসহ সদল বলে ওড়াকাঁন্দি যাত্রা করেন। কবিরসররাজ তারকচন্দ্র সরকারের দলের বর্ণনা করেন বিচরণ পাগল। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত। এমনকি কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে সকলেই ভাল বাসতেন। হরিমন্দিরে প্রত্যেক বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর ঘট স্থাপনের আগে ভক্তগণের বাড়িতে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের নামের নিশান পূজা করা হয়। প্রথমেই ভক্ত কবি তারকচন্দ্র সরকার নামের নিশান উত্তোলন করেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের মতুয়াদল গঠনের বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী গঠনের কথা বিচরণ পাগল এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''শ্রীহরির প্রেমের মেলা শ্রীধামেতে হবে।

মতোগণে পাবে শান্তি বারুণী উৎসবে।।

বাজিবে বিজয় ডঙ্কা নিশান উড়িবে।

এসব প্রস্তুত মোর করিতে হইবে।।

বড় বড় পাখা আমি করিয়া লইব।

দলবল সাজাইয়া বারুণীতে যাব।।

.....

জয়ডঙ্কা ঝাঁজ কাঁস খোল করতাল।

শিঙ্গা ধবনি করে সবে শুনিতে রসাল।।

এই সব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল।

অতঃপর শ্রীতারক নিশান উড়াল।।

প্রথমেই এই সব আবিস্কার হল।

নামের নিশান সেই তারক উড়াল।।

.....

শব্দ হল তারকচাঁদের দল এল।

সবাই আনন্দ রসে ভাসিয়ে চলিল।।

পাখা হাতে কেহ কেহ দিতেছে বাতাস।

কীর্ত্তনেতে সবাকার বাড়িল উল্লাস।।

চারিদিকে সবে বলে জয় জয় জয়।

শ্রীহরিচাঁদের জয় গুরুচাঁদ জয়।।

.....

রামচাঁদ চৌধুরীর আনন্দ ধরে না।

মালু বলে হেন দিন আর তো হবে না।।

.....

প্রথম প্রকাশ এই হইল বারুণী।

দেশে কি বিদেশে গেল সেই ধ্বনি।।''[৩১]

প্রথমে এভাবে বারুণী আরম্ভ হয়েছে আজ ধর্ম বর্ণ জাতি নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রিত হয় মহাবারুণী উৎসবে। বারুণীতে যাওয়া উৎসব এক মহামিলন মেলা। এক কথায় মতুয়া ভক্তদের সবচেয়ে বড় উৎসব হল হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি পালন মহাবারুণীর স্নান উৎসব বা বারুণীর মেলা।

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক কাজের নিয়ম :

সামাজিক জীবনে মানুষের অনেকগুলি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থাকে। যেমন—বিবাহ,

মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, শিশুর নামকরণ, অন্নভোজন বা মুখেভাত, গৃহপ্রবেশ ও সামাজিক অন্যান্য কর্মগুলি মতুয়া ধর্ম মতে মতুয়া আচার্য বা মতুয়া গোঁসাইগণের দ্বারা করেন মতুয়া ভক্ত মানুষেরা।

বিবাহ পদ্ধতির নীতি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

বিবাহ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'দধিমঙ্গল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বিবাহের দিন খুব ভোরবেলা বর ও কন্যার স্বস্ব বাসভবনে দৈ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করে, বিবাহের দিনের ক্রিয়া পদ্ধতির আরম্ভ হয়।

অদিবাসের স্নান করানো হয় বর ও কন্যার নিজের বাড়িতে। সেখানে জলবরণ করে জল তোলা হয় তারপর বাড়িতে বসে গায়ে হলুদ দিয়ে ত্রয়ো স্ত্রীগণ মঙ্গলাচারে স্নান করান বরও কন্যাকে। বিবাহ স্থির হলে বরের বাড়িতে বর কর্তা ও কনে কর্তা ঘট মঙ্গল করে বিবাহ পাকা করে।

বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :

কন্যার জন্য শাঁখা, বর কন্যার নববস্ত্র, মঙ্গল ঘট, ফুলের মালা, ফুল, তিল তুলসী, বেলপাতা, কাঁচা হলুদ, গ্রন্থি বন্ধনের লালচেলি, লাল সূতা, ধান-দূর্বা, যব, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, সুপারি ও জায়ফল। বরের টোপর, কনের মুকুট, আশীর্বাদী কুলা ১টা, প্রদীপ, ধূপদানী, ধূপকাঠি, চন্দন ইত্যাদি।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম :

নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি শ্রদ্ধানুষ্ঠান। নান্দীমুখ অনুষ্ঠানে প্রয়াত গুরুজনদের স্মরণ-মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই হলো বৃদ্ধি শ্রদ্ধা বা নান্দীমুখ।

বিবাহ আসর সাজান হয় কনের বাড়িতে। বরযাত্রীসহ কন্যার বাড়িতে যায় ও সেখানেই বিবাহ হয়। মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয় হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর। যেখানে বসে, মতুয়া আচার্য বা মতুয়া গোঁসাই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বিবাহের নিয়মানুসারে সাতপাক প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল ও হৃদয় বিনিময়, সিঁদুর পরানো, গ্রন্থিবন্ধন ও সকলের সমবেত

প্রার্থনায় ও আশীর্বাদে বিবাহ অনুষ্ঠান কাজ সমাপ্ত হয় ও সরকারী নিয়মানুযায়ী রেজিট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ায় মতুয়া বিবাহেও এই নিয়ম অবশ্যই পালন করেন। কখনো বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে কোথাও সেই দিনে ম্যারেজ রেজিষ্টার দিয়ে করানো হয়।

বিবাহ সমাপ্ত হবার আগে ও পরে কন্যার পিতা যথাসাধ্য অনুযায়ী বরযাত্রী ও আত্মীয়দের সম্মান পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন করে ভোজন করান। বরকর্তার পিতা ও গুরুজনগণও যথাসাধ্য তার আত্মীয়-পরিজনকে ভোজন করান বিবাহ উপলক্ষে, বিবাহ করে আসার পর। বৌভাতের বা পাকপরশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

মতুয়া ধর্মাদর্শে শুভ বিবাহের একটি উদাহরণ তুলে ধরলাম। ''গত ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৪১৭ (ইংরাজি ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০), বুধবার চিংড়ীঘাটা, কল্যাণ সাউথ রোড, পো: নাওভাঙা, কলমাতা ১০৫ নিবাসী শ্রীমুকুন্দ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় ধ্রুবজ্যোতির সহিত মুড়াগাছা, নদীয়া নিবাসী শ্রীশ্যামাপদ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা বিউটির শুভ বিবাহ মতুয়া আদর্শ মতে ড. বিরাট কুমার বৈরাগ্য মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়।''[৩২]

শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন :

মতুয়া ধর্মানুযায়ী মৃত ব্যক্তির প্রতি রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন করেন। মতুয়া ধর্মানুযায়ী মৃতদেহকে সমাধি ও দাহ করা হয়।

মৃত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে পরিবারের ও গ্রামের আত্মীয় পরিজন একত্রে মিলিত হয়ে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। সুন্দর সাজ সজ্জায় সজ্জিত করে সযত্নে দোলা বা চৌকিতে করে শবদাহ শ্মশানে বা সমাধি স্থানে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র ফুলের মালা চন্দন ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করে শেষ কৃত্য হিসাবে দাহ বা সমাধি দেওয়া হয়। 'হরিবল' ধ্বনিতে ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় সমাধি ক্ষেত্রে।

মৃত ব্যক্তির পুত্ররাও পুত্রবধূগণ ও কন্যা সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতার প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেই নিয়মাবলী হল—

পুত্ররা দশ দিন যাবৎ পিতার উদ্দেশ্য নিয়ম পালন করে। বিবাহিত কন্যা চারদিনে পিতা মাতার শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন করে। দশদিন পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণ একবার হবিষান্ন আহার করে। ও এক বস্ত্রধারী হয়। ও দশদিন সাধারণত কম্বলে মেঝেতে ঘুমায়। ও সন্ধ্যায়

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের আরাধনা করেন। দশদিনে 'দশা' পালন করে ক্ষুরকর্ম করে সকল শ্মশান যাত্রীদের ও দশার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন মতুয়া ধর্মানুসারে কোন মতুয়া গোঁসাই বা আচার্য দ্বারা। একাদশ দিনে শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন ও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে ভোগরাগ নিবেদন করা হয়। মতুয়া বিধানানুসারে। দ্বাদশ দিনে বিশ্রাম ও 'শ্রীহরিলীলামৃত' পাঠ। এয়োদশ দিনে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ভোজন করান গৃহকর্তা সাধ্যানুসারে মতুয়া মতে গৃহ নির্মাণের পূজা, গৃহ প্রবেশ, শিশুর নামকরণ, শিশুর মুখে ভাত বা অন্নপ্রাসন করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়ার সকল কাজই মতুয়া ধর্মানুসারে করেন মতুয়া ভক্তগণ।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৫. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭৩।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪।

৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

৮. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭২-৫৭৩।

৯. রায় ঠাকুর, নবকুমার—শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ নিত্য পূজা বিধি, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

১১. সরকার, শ্রীঅশ্বিনীকুমার—শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, দ্বাবিংশতিতম সংস্করণ, বারুণী মহামেলা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০১০, পৃ. ৩-৪।

১২. রায় ঠাকুর, নবকুমার—শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ নিত্য পূজা বিধি, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১৩. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪।

১৬. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৫।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৪. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৩২।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৬।

২৮. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৩৪।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

৩২. শ্রীহরি যুগ দিশ, পৃ. ১১।